নবী জীবনের আদর্শ

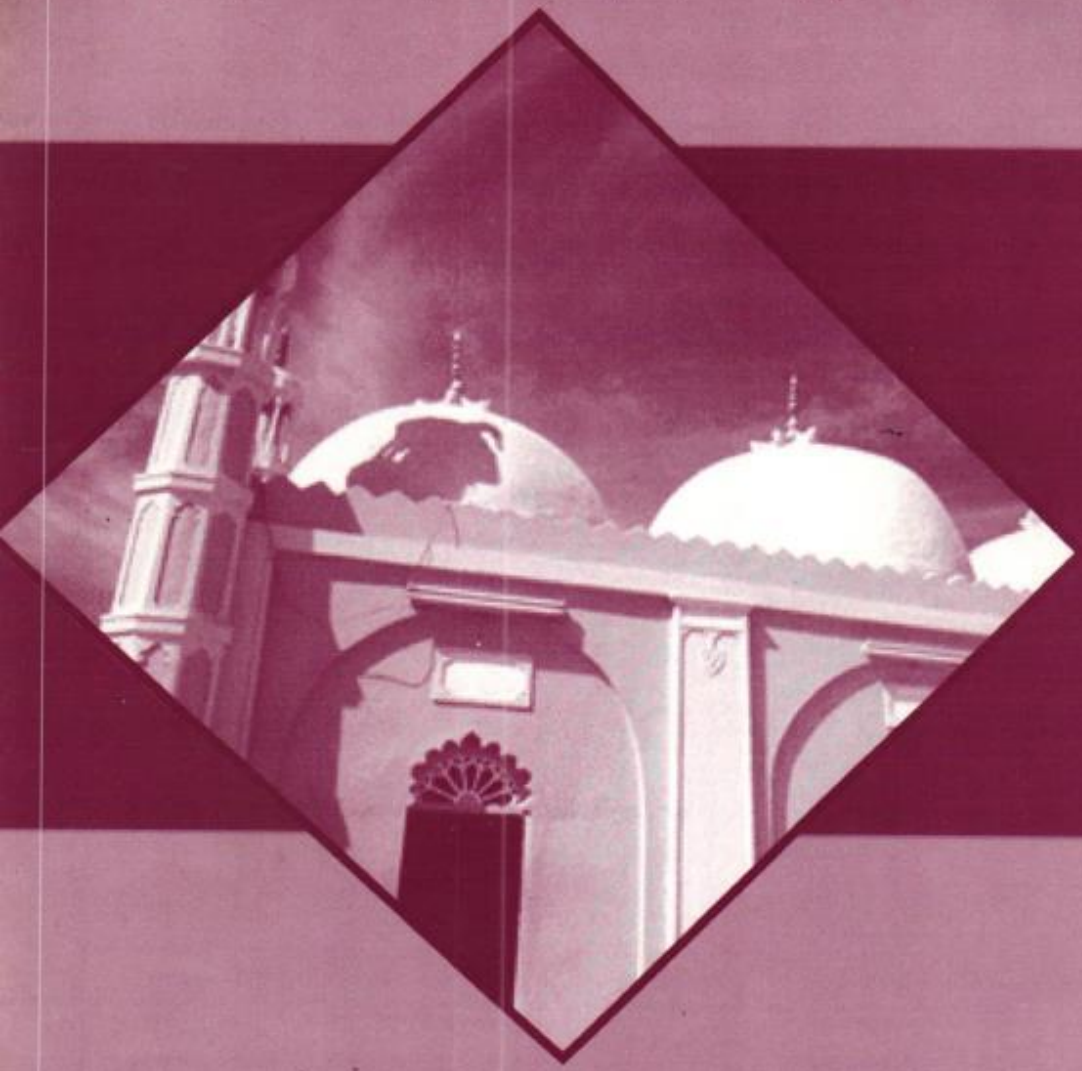

অধ্যাপক গোলাম আযম

নবী জীবনের আদর্শ

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনায়
আল আযামী পাবলিকেশন্স
১১৯/২, কাজী অফিস লেন, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.amarboi.org

ভূমিকা

নারী, পুরুষ, শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সকলের জন্যেই আদর্শের প্রয়োজন, যে আদর্শকে অনুসরণ করে গড়ে উঠবে সুন্দর জীবন। তাই 'আদর্শ' মানুষের জীবন গঠনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এত গুরত্বপূর্ণ যে 'আদর্শ' তা বাছাই করে গ্রহণ করার যোগ্যতা সবার সমান নয়। শিশু ভালমন্দ বিচার করে আদর্শের অনুসরণ করতে পারে না, সহজাত প্রবৃত্তিতে সামনে যা পায় সে তাই অনুসরণ করে। কিশোর তাই অনুসরণ করে যা তার কাছে ভাল লাগে। যুবক আর বয়স্করা বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে আদর্শ বাছাই করে তা অনুসরণ করার চেষ্টা করে।

তাই শিশুদের জন্য প্রয়োজন সুন্দর আদর্শের পথে পরিচালিত করা, কিশোরদের সামনে দরকার সুন্দর আদর্শ তুলে ধরা আর বয়স্কদের সামনে থাকা দরকার একটা প্রামাণ্য আদর্শ। ছোট এ বইটিতে আছে এমনই সুন্দরতম আদর্শের সন্ধান। যে আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছিল নবী মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনে। তবে এ বইটি তাঁর জীবনী নয়। বরং তাঁর জীবনীই যে সকলের অনুসরণযোগ্য উত্তম আদর্শ এ তারই যুক্তিপূর্ণ আলোচনা। আলোচনা যুক্তিপূর্ণ ও প্রামাণ্য হলেও লেখক তা উপস্থাপন করেছেন সহজ, সরল, সাবলীল ও বোধগম্য ভাষায়।

বইটি প্রয়োজন মিটাতে পারবে সকলেরই– যারা জীবনে চলার পথে সুন্দর আদর্শের সন্ধান পেতে চান এবং তা অনুসরণ করতে চান। এই প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে যদি বইটি সামান্যতম অবদান রাখতে সক্ষম হয় তবে সেটাই হবে আমাদের সাফল্য।

প্রকাশনায় : আল আযামী পাবলিকেশন্স, ১১৯/২ কাজী অফিস লেন, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
মুদ্রক : তাসনিম কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স, বড়মগজাজার, ঢাকা, ফোন- ০১৭১১৫৮১২৫৫।
প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৬০, **অষ্টম প্রকাশ** : মে ২০০৬, **মূল্য ঃ ৫.০০ টাকা মাত্র** (এক দামে ক্রয় করুন)

www.amarboi.org

নবী জীবনের আদর্শ

মানব জীবনে আদর্শের প্রয়োজনীয়তা

যা অনুকরণ ও অনুসরণের উপযোগী তাই আদর্শ। ইংরেজী 'মডেল' শব্দ দ্বারা যে ভাব প্রকাশ করা যায়, আদর্শ শব্দে পরিপূর্ণভাবে সেই ভাব প্রকাশ পায়। মানুষের জীবনের সব অবস্থায় এবং সব মানুষের জীবনেই আদর্শের প্রয়োজন। আদর্শ লিপি বই দেখে যেমন শিশু সুন্দর করে লিখতে শিখে, তেমনি মানুষকে সবদিক দিয়ে উত্তম কোন মানুষকে অনুকরণ করে উন্নত হতে হয়। মানুষ স্বভাবত কোন অনিশ্চিত অবস্থার দিকে অগ্রসর হতে পছন্দ করে না বলেই তার রুচী অনুযায়ী অন্য কোন যোগ্য মানুষকে আদর্শ হিসেবে বেছে নেয় এবং তার আদর্শকে অনুসরণ করে অগ্রসর হয়।

বুঝে শুনে হোক বা না বুঝেই হোক, মানুষ কোন না কোন মানুষকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কেননা মানুষ মাত্রেই জীবনে বড় হবার আকাঙ্ক্ষা থাকে। এই আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে একটা কাল্পনিক আদর্শ তার মনে দানা বাধে। কিন্তু বাস্তব জীবনে শুধু একটা কাল্পনিক আদর্শই মানুষের ভিতর কাজের উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারে না। তাই ঐ আদর্শের ভিত্তিতে অতীত বা বর্তমানের কোন বাস্তব মানুষকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করতে হয়।

একজন তরুণ দার্শনিক তার দৃষ্টিতে আদর্শস্থানীয় দার্শনিককে 'মডেল' হিসেবে গ্রহণ করে। একজন উদীয়মান রাজনীতিক কোন প্রতিষ্ঠিত নামকরা রাজনৈতিক নেতাকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তার মত বড় হবার সাধনা করতে থাকে। অধ্যাপক, শিক্ষক, কবি, সাহিত্যিক, ডাক্তার, এডভোকেট, ব্যবসায়ী-সকলের জীবনেই বড় হবার পথে আদর্শ মানুষ তালাশ করার প্রয়োজন হয়।

শৈশবকাল থেকেই মানুষ অপর মানুষকে অনুকরণ করে বাঁচতে শিখেছে। শুধু খাওয়া-পরা, হাঁটা-চলা, কথা বলাই নয়– এই শিক্ষা-পদ্ধতি তার সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই স্বাভাবিক শিক্ষানীতিই মানুষের জীবনে আদর্শের আবশ্যকতা সৃষ্টি করে।

আদর্শের সন্ধানে প্রধান সমস্যা

মানব জীবনে আদর্শের অপরিহার্যতা স্বীকার করে নেবার পর প্রয়োজন দেখা দেয় অনুকরণযোগ্য 'আদর্শ মানুষের' সন্ধান করা। আর এখানেই বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। কারণ এ সমস্যার সমাধান অত্যন্ত কঠিন। কেননা কোন কালে এবং কোন দেশেই এমন একজন লোক পাওয়া যায় না যাকে সকল দিক দিয়েই অনুকরণযোগ্য বলে মেনে নেয়া চলে। আদর্শ দার্শনিক ব্যক্তি বাস্তব জীবনে আদর্শ নাও হতে পারে। আদর্শ রাজনীতিক বলে যাকে অনুকরণ করা শুরু হল, পারিবারিক জীবনে তাকে ঘৃণ্য বলেও মনে হতে পারে। আদর্শ সাহিত্যিক বলে পরিচিত লোকটি ব্যক্তিগত জীবনে পংকিলও হতে পারে। এডভোকেট হিসেবে যাকে আদর্শ মনে হয় তার রাজনৈতিক জীবন কলংকময় হতে পারে। এমতাবস্থায় যাকে একদিক দিয়ে আদর্শ মনে করা হলো তার জীবনের অন্যান্য দিকের জন্য তাকে ঘৃণা করতে হয়। ফলে তা বিরাট একটা মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করে। এই মানসিক সমস্যা বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে তাকে অনুকরণ করা সম্ভব হয় না। ফলে তাকে অনুকরণযোগ্য বলে স্বীকার করে নিলে মনের অগোচরেই তাকে অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনুসরণ করা হতে থাকে। তখন উক্ত 'আদর্শ' ব্যক্তির জীবনে যে সব ঘৃণ্য বিষয় বর্তমান

www.amarboi.org

থাকে সেগুলোকেও কোন প্রকারে ভাল বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলে। এ কারণে এবং এভাবেই অকল্যাণকর অনেক কিছুই হিতকর হিসেবে চিত্রিত হয় এবং সেগুলোকে সমাজে চালানোর প্রচেষ্টা চলে।

কাউকে একবার আদর্শ বলে গ্রহণ করলে প্রায় সবক্ষেত্রেই তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা শুরু হয়ে যায়। তখন এই আদর্শ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই ভাল ও মন্দের ধারণা সৃষ্টি হয়। এ কারণেই অনুকরণকারী তার নির্বাচিত আদর্শ ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি সত্য হলেও তা দোষ বলে স্বীকার করতে চায় না। ফলে অনুকরণকারীর পক্ষে পুরোপুরি আদর্শের অনুসরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সুতরাং যদি এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় যিনি জীবনের সবদিক ও বিভাগে অনুকরণযোগ্য তাহলে তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলে আর কোন সমস্যা থাকে না। কিন্তু এমন একজন আদর্শ ব্যক্তির সন্ধান পাওয়াই মানুষের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা।

মানব জীবন

জীবনের সকল স্তরে এবং সকল দিকে এক ব্যক্তিকে আদর্শ হিসেবে পাওয়া একটা বিরাট সমস্যা। মানব জীবনের ব্যাপকতা অনুধাবন করতে পারলে এ সমস্যার বিরাটত্ব সহজে অনুধাবন করা যাবে।

প্রথমত, একজন ব্যক্তির জীবনে শৈশব থেকে আরম্ভ করে বার্ধক্য পর্যন্ত অনেকগুলো স্তর রয়েছে। এর প্রতিটি স্তরেই তার জন্য আদর্শের প্রয়োজন। এমন কোন মানুষ পাওয়া যাবে না যাকে বাল্যকাল থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সকল স্তরেই আদর্শ বলে স্বীকার করা যায়। তারপর একজন মানুষের জীবনে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্নেহ, ভালবাসা, আবেগ ও ভাবপ্রবণতা মিলে এমন এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তাকে জীবনের প্রতিটি ব্যাপারেই আদর্শস্থানীয় হিসেবে মেনে নেয়া কিছুতেই সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত, পারিবারিক জীবনে একজন মানুষকে বহুলোকের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হয়। একই ব্যক্তি স্বামী, পুত্র, চাচা, ভাতিজা, ভাই, মামা, ভাগনে, ফুফা, খালু, শ্বশুর, জামাতা ইত্যাদি অনেক প্রকারের সম্পর্কে জড়িত এবং তাকে সেই অনুযায়ী প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করতে হয়। ফলে এমন কোন মানুষ পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে যিনি এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার সমগ্র জীবনে আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হতে পারেন।

তৃতীয়ত, সমাজ জীবনের ক্ষুদ্রতম এলাকা পাড়া বা মহল্লার প্রতিবেশীদের সাথেও সঠিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হয়। সৎপ্রতিবেশীর সাথে হয়তবা ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু শত্রু-মিত্র, সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকল প্রতিবেশীর সাথে আদর্শ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের হক আদায় করা কি সম্ভব?

চতুর্থত, সমাজ জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অগণিত মানুষের সাথে বহুমুখী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। লেন-দেন, কেনা-বেচা, আইন রচনা, শাসন করা ও শাসন মেনে চলা, বিচার করা ও মেনে চলা, আইন জারী করা, আইন মেনে চলা ও অমান্য করা ইত্যাদি বিষয়ে সমগ্র জীবনে আদর্শস্থানীয় বলে কোন এক ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া কি সম্ভব?

পঞ্চমত, কোন এক ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে কোন এক দেশের পক্ষে আদর্শ হলেও দুনিয়ার সকল দেশের সাথে যুদ্ধ, সন্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ওয়াদা পালনে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত নীতি মেনে চলার ব্যাপারে আদর্শ বলে বিবেচিত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

www.amarboi.org

সবশেষে, একই ব্যক্তির পক্ষে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ স্থাপনের সুযোগ ও অবকাশ পাওয়া কি সম্ভব? আইনদাতা, শাসক, বিচারক, রাষ্ট্রনায়ক, সেনাপতি, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক, সাহিত্যিক ইত্যাদি সকল দিকে আদর্শ হওয়া এক ব্যক্তির পক্ষে কি করে সম্ভব হতে পারে? কোন এক ব্যক্তির জীবনে এত বিভিন্ন ধরনের কর্মক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদনের সুযোগ পাওয়াই অসম্ভব! তদুপরি একই ব্যক্তির ভিতর এত প্রকারের গুণাবলী ও ঝোঁক প্রবণতা থাকাও অসম্ভব। সুতরাং মানব জীবনের ব্যাপক পরিধিতে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার যোগ্য 'একজন মানুষ' পাওয়ার সমস্যাটি মানুষের কাছে কঠিনতম সমস্যা।

নবী জীবন এ সমস্যারই সমাধান

মানব জীবনের সকল স্তর, দিক ও বিভাগে একই ব্যক্তিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে না পারলে মানুষের জীবনে সুন্দর সামঞ্জস্য সৃষ্টি হতে পারে না– এ কথা যেমন সত্যি; নবী ব্যতীত আর কোন মানুষের পক্ষেই যে সেরূপ আদর্শস্থানীয় হওয়া সম্ভব হয় না সে কথাও তেমনি মহাসত্য। যে আল্লাহ মানুষের জীবনে আদর্শের সন্ধান ও তার অনুসরণ অপরিহার্য করে দিয়েছেন তিনিই তা তালাশ করার সুবিধার জন্য মানুষের মধ্যে নবী ও রসূল পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন।

কোন মানুষই নিজেকে নির্ভুল বলে দাবী করতে পারে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন ভুল-ভ্রান্তি তাকে স্পর্শ করেনি এ কথা বলার সাহস কারো থাকতে পারে না। কেউ তা দাবী করলে তা সত্যের অপলাপ মাত্র। কিন্তু নবী ও রসূলগণ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলাই নির্ভুল পথে পরিচালিত করেন। যে আল্লাহ অনন্ত অসীম নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী তিনিই ওহির মাধ্যমে নবী-রসূলদেরকে নির্দেশ পাঠান। তাই তাঁদের গোটা জীবনই সঠিকভাবে পরিচালিত হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নবী ও রসূলগণ জন্ম থেকেই নবী। আল্লাহপাক স্বয়ং তাঁদেরকে পরিচালিত করেন। যদিও ওহি নাযিল হওয়ার পূর্বে তারা নিজেদেরকে নবী বলে জানতে পারেন না, তথাপি নবী সুলভ চরিত্র দ্বারা সকল সময় তাঁরা ভূষিত থাকেন। তাই একমাত্র নবীই সকল অবস্থায় মানুষের জন্য আদর্শ।

শেষ নবীই একমাত্র অনুসরণযোগ্য আদর্শ

সকল নবীই নির্ভুল জীবনের অধিকারী। তাঁরা আল্লাহর ওহির দ্বারা পরিচালিত। এ কারণে তাঁরা সকলেই মানুষের জন্যে অনুসরণযোগ্য আদর্শ। কিন্তু এখন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-ই একমাত্র বাস্তব আদর্শ হিসেবে অনুসরণযোগ্য। কারণ তাঁর পূর্বের রসূলদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত ওহির জ্ঞান আজ আর নির্ভুল ও অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান নেই। তাঁদের নিকট প্রেরিত কিতাব মূল ভাষায় উদ্ধার করার উপায় নেই এবং তাঁদের জীবন যাপন প্রণালী (সুন্নত) সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করারও কোন পথ নেই। তা সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই আদর্শস্থানীয় মানুষ।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) নবীদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। সকল নবীর আদর্শই তাঁর জীবনে পূর্ণতা পেয়েছে। তাঁর নিকট প্রেরিত আল্লাহর বাণী আল-কুরআন পূর্ববর্তী সকল ওহির পূর্ণরূপ। আল্লাহ পাক আর কোন নবী পাঠাবেন না। তাই কুরআনকে অবিকৃত অবস্থায় হেফাজত করার দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ 'নিশ্চয় এই কুরআন আমিই নাযিল করেছি এবং আমিই এর হেফাজতকারী।' (সূরা আল-হিজর-৯ আয়াত)

আল্লাহ পাক যেমন কুরআনকে হেফাজত করেছেন তেমনি তাঁর নবীর সমগ্র জীবনের ইতিহাসকে মানব জাতির জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁরই জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে

www.amarboi.org

কুরআনের বাস্তবরূপ- যা মানব জাতির জন্যে সর্বোত্তম আদর্শ। বিশ্বের আর কোন মানুষের সমগ্র জীবনের বিভিন্ন দিক বিভাগ সম্পর্কে এত বিস্তারিত জানার কোন উপায় নেই। বিপুল হাদীস বিদ্যার সংকলন, তার সত্য-মিথ্যা যাচাই-বাছাই ও গবেষণার মাধ্যমে সে নবীর বাস্তব জীবনকে সঠিকরূপে জানার ও অনুসরণ করার যে ব্যবস্থা আল্লাহ করে রেখেছেন তার নজীর আর কোন মহামানবের বেলায় দেখা যায় না। মুহাদ্দিছ অভিধায় পরিচালিত একদল অতি উন্নত চরিত্রবান মানুষ কর্তৃক শেষ নবীর সমগ্র জীবন সম্পর্কে সকল তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষিত হয়েছে। তারা ছিলেন অতি তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সত্যের সন্ধানকারী। তারা ভক্তির আতিশয্যে নবীর জীবন সম্পর্কে কোন অতিরঞ্জিত কথা বা অসত্য বিষয়কে গ্রহণ করতে রাজী হননি।
সুতরাং একমাত্র মুহাম্মদ (স.)কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলেই সকল নবীকে অনসুরণ করা হবে। অন্যান্য প্রেরিত কিতাবের হেদায়াত যেমন কুরআনের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব, তেমনি যে কোন নবীর আদর্শের অনুসরণ করা সম্ভব একমাত্র শেষ নবীর অনুসরণের মাধ্যমে। তাই আল্লাহ পাক স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ 'আল্লাহর রসূলের (মুহাম্মদ স.) মধ্যেই তোমাদের জন্যে সুন্দর আদর্শ রয়েছে। (আল আহযাব-২১ আয়াত)
আদর্শ কখনো অসুন্দর হতে পারে না। তা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক 'সুন্দর আদর্শ' উল্লেখ করেছেন। কারণ মানুষ আদর্শ ব্যতীত চলতে অক্ষম বলে অসুন্দরকেও আদর্শ মনে করে বসে। তাই তিনি মানুষের জীবনে সর্বকালের জন্যে একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (স.)-কেই সুন্দরতম আদর্শ হিসেবে নির্দেশ করেছেন।

নবী জীবনের বাস্তব আদর্শ

এখন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বাস্তব জীবনের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থায় মানব জাতির জন্যে কিরূপ আদর্শ ছিলেন তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। অন্যান্য মহামানবের ন্যায় তার জীবন থেকে কিছু সংখ্যক আদর্শ বেছে বের করা অর্থহীন। কারণ তাঁর গোটা জীবনটাই আদর্শ। তাঁর জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ও আদর্শের মর্যাদা রাখে।

শৈশবে

নবী করীম (স.) তাঁর শৈশবে যে সুন্দর চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন তা একজন আদর্শ শিশুরই উপযোগী। আমরা যদি নিজেদের পরিবারের তথা সমাজের ছেলেমেয়েদেরকে 'শিশু মুহাম্মদের' আদর্শে গড়ে তুলতে পারি তাহলে যে কোন ব্যক্তিই তাদেরকে আদর্শ বলে স্বীকার করবে। তাই তাঁর শৈশব জীবনের প্রতিটি ঘটনা মানব শিশুদের জন্য উৎকৃষ্টতম আদর্শ। ছোটদের উপযোগী করে লেখা নবী জীবনী পাঠ করলে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ও ঘটনা জানার সুযোগ হবে।

কৈশোরে

তৎকালীন আরবের অন্ধকার যুগের বর্বর সমাজের বালকদের মধ্যে 'বালক মুহাম্মদের' যে পরিচয় রয়েছে তা এতই স্পষ্ট, সুন্দর এবং আকর্ষণীয় যে, এই এতিম বালকটির কিশোর বয়সের উজ্জ্বল ঘটনাবলী তাঁর সমবয়সীদের মনে গভীর ছাপ রেখেছিল। তাই তাঁর পরিণত বয়সেও বালক মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে কোন বেগ পেতে হয়নি। পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে চলাফেরায়, মাঠে ময়দানে রাখাল বালকদের সাথে মেষ চারণায় এবং প্রতিদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার ব্যবহারে বালক মুহাম্মদ মক্কার প্রশংসনীয় বালকদের নিকটও আশ্চর্য চরিত্রের অধিকারী বলে পরিচিত ছিলেন। কিশোর বয়সেই

www.amarboi.org

ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনের সবচেয়ে উপযোগী সময়। এ সময়েই তাদেরকে আদর্শের আলোকে গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। যদি কিশোর মুহাম্মদের চরিত্র সত্যিই আদর্শ হয়– এবং নিঃসন্দেহে তাঁর চরিত্রই সর্বোত্তম আদর্শ। তবে অন্য সব ধরনের আদর্শ ত্যাগ করে কিশোরদেরকে বালক মুহাম্মদ (স.)-এর আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। এজন্যে বিশেষ করে বাংলাদেশের বিদ্যালয়সমূহে বালক মুহাম্মদ (স.)-এর চরিত্র শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যৌবনে

সে সময় আরবের সমাজে সকল প্রকার চরিত্র ধ্বংসকারী রীতি ও ব্যবস্থা চালু ছিল। তা সহজেই যুবকদেরকে ভোগবাদী ও স্বার্থপর করে তুলতো। তা সত্ত্বেও 'যুবক মুহাম্মদ' পঁচিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়া খাদীজা (রা.)কে বিয়ে করে সমসাময়িক যুব সমাজে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেন। তৎপূর্বে খাদিজা (রা.)-এর বিরাট ব্যবসা সততা ও নিষ্ঠার সাথে পরিচালনা করে তিনি বিশ্ববাসীর নিকট আদর্শ স্থাপন করেন।

সমগ্র মানব জাতির জন্যে সমাজসংস্কারের যে শ্রেষ্ঠতম আদর্শ তিনি রেখে গেছেন, যুবক বয়সেই তিনি তাঁর সূচনা করেন। আবু বকর (রা.) এবং সমবয়সী আরো কিছু যুবককে নিয়ে তিনি 'আল হিলফুল ফুযূল' নামক একটি যুব সংগঠনে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন সংস্কারমূলক ও সেবামূলক কাজ করে সমাজে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। তৎকালে মক্কা ছিল আরবের কেন্দ্রস্থল। সেখানেই ছিল কাবা ঘর। তাই হজ্জের মৌসুমে দেশের সকল এলাকা থেকে লোক এসে মক্কায় ভীড় করতো। যুবক মুহাম্মদ তাঁর সমিতির বহুমুখী কাজের মাধ্যমে এসব লোকের সাথে পরিচিত হন। পরিচিত হলেন তিনি 'আল আমীন' নামে। সমাজের ছোট খাট ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা, দুর্বলকে সবলের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা, আমানত বিশ্বস্ততার সাথে রক্ষা করা, মারামারি হানাহানির প্রতিরোধ ইত্যাদি অসংখ্য কার্যাবলীর মাধ্যমে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেন। এতিম যুবক হয়েও তিনি মক্কার সমাজপতিদের নিকট মর্যাদার আসন লাভ করেন।

কাবা ঘরের দেয়াল মেরামত কালে 'হাজরে আসওয়াদ' নামক বিখ্যাত কালো পাথরটি দেয়ালে স্থাপন করার অধিকার নিয়ে মক্কার নেতাদের মধ্যে ঝগড়া বাধে। আল হিলফুল ফুযূল সমিতির নেতা যুবক মুহাম্মদের উপর সেই ঝগড়া মীমাংসা করার দায়িত্ব দেয়া হয়। একখানা চাদরের উপর 'আল আমীন' স্বয়ং পাথরটি উঠিয়ে দিলেন। অতঃপর বিবদমান নেতাদেরকে দিয়ে চাদরের চার পাশ ধরিয়ে দেয়ালে উঠালেন। এভাবে নৈতিক দিক দিয়েও যুবক মুহাম্মদের নেতৃত্ব সমাজ নেতাদের উপর কায়েম হল। তাই নবুয়ত পাওয়ার তৃতীয় বছরে তাঁর দেশবাসীকে আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছানোর জন্য তিনি যখন ছাফা পাহাড়ের নিকট সকলকে একত্রিত হতে আহ্বান জানালেন, তখন আবু লাহাব ও আবু জেহেলের ন্যায় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী নেতারাও এই এতিম যুবকের ডাকে সেখানে হাজির হবার প্রয়োজন অনুভব করেছিল।

স্থান-কাল নির্বিশেষে যুবসমাজের জন্য যুবক মুহাম্মদের মত কোন আদর্শ যুবকের সন্ধান ইতিহাসে খুঁজে আর একটিও পাওয়া যায় কি? আজ আমাদের নওজোয়ানরা যদি যুবক মুহাম্মদকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে তবে নিশ্চিতভাবে বিশ্বের সকল দেশের যুবকদের সামনে তারা আদর্শ হিসেবে প্রমাণিত হবে। পরিণতিতে শুধু আমাদের দেশে নয়, পবিত্রতার এক মহাবন্যায় বিশ্বের মানব সমাজের সকল আবিলতা ধুয়ে মুছে এক সুন্দর মানব জাতির সৃষ্টি হবে।

www.amarboi.org

তৎকালীন আরব সমাজে নগ্নতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কলুষিত পরিবেশে 'যুবক মুহাম্মদ' চারিত্রিক পবিত্রতার এক মহান নজীর স্থাপন করেছিলেন। আজকে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার খোলসে নতুন করে পুনরাবির্ভূত সেই চরিত্র-বিধ্বংসী পরিবেশে তাঁর দৃষ্টান্ত থেকে যদি আমাদের যুব সমাজ প্রেরণা না নেয় তবে প্রলয় সৃষ্টিকারী ধ্বংসের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। যুব সমাজ যে গতিতে এই তথাকথিত প্রগতি ও আধুনিকতার অন্ধ অনুকরণে এগিয়ে চলেছে এবং জাতির পরিচালকের আসনে সমাসীন ব্যক্তিরা এর পরিপ্রেক্ষিতে যে ধরনের আচরণ করছেন তাতে এই ধ্বংস থেকে জাতিকে রক্ষা করার বলিষ্ঠ প্রতিরোধের দায়িত্ব ঐসব যুবকদের উপরই ন্যস্ত যারা মুহাম্মদ (স.)কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

সমাজে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্যে 'যুবক মুহাম্মদ' যে 'টেকনিক' বা পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন চিরদিনই তা একমাত্র যুক্তিপূর্ণ এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত থাকবে। সমাজের সমস্যা নিয়ে যারা চিন্তা করেন এবং ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে তা সমাধানের কাজে নেমে পড়েন, তারাই সমস্যার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারেন। এই ধরনের লোকের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হলেই কেবল জাতীয় সমস্যার সমাধান হতে পারে। সমাজ সেবক না হয়ে সমাজের সমস্যার সাথে পরিচিত না হয়ে যারা সংক্ষিপ্ত (শর্টকাট) পথে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চান, তাদের দ্বারা সমস্যার সমাধান নয়, সমস্যার সৃষ্টিই শুধু সম্ভব। যুবক মুহাম্মদ জনসেবার মাধ্যমে সমাজের সমস্যাবলী সম্পর্কে যে বাস্তব জ্ঞান লাভ করেছিলেন তাতে পরিণত বয়সে আল্লাহর প্রেরিত সমাধানকে কার্যকরী করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়েছিল। এইভাবে প্রথম থেকে সেবক হিসেবে তৈরি না হলে নেতৃত্বের গদী হঠাৎ করে কাউকে সেবাধর্মী করে গড়ে তুলতে পারে না।

পরিণত বয়সে

পরিণত বয়সে নবুয়ত প্রাপ্তির পর তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত হযরতের জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ই মানুষের জন্যে আদর্শ। এরূপে আদর্শ শিশু, আদর্শ কিশোর, আদর্শ যুবক ও আদর্শ মানুষ হিসেবে হযরতের সমগ্র জীবনই মানব জীবনের সর্বস্তরে অনুসরণ ও অনুকরণের শ্রেষ্ঠতম নমুনা।

ব্যক্তিগত জীবনে

হযরতের ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে যত কিছু অভ্যাস ছিল তা সবই এত সুন্দর যে সে বিষয়ে যতই চিন্তা করা যায় ততই তা অনুকরণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়। তাঁর চলা, বলা, উঠা-বসা, খাওয়া, শোয়া, মেলামেশা, হাসি-খুশি, রাগ-অনুরাগ, শাসন ও সোহাগ ইত্যাদি সবকিছুই স্বাস্থ্যবিধি ও ভদ্রতার দিক দিয়ে এতই আদর্শস্থানীয় যে তাতে চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই আকৃষ্ট হতে বাধ্য। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি বিষয় যদিও মুসলমানদের উপর বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়নি, তবুও চিরদিন আল্লাহপ্রেমিক মানুষেরা তাকে সকল বিষয়েই অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছেন।

আল্লাহর মনোনীত এই আদর্শ মানবকে মনে প্রাণে ভালবাসাতেই নিহিত রয়েছে আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও তাঁর প্রিয় হবার উপায়। তাই কুরআন মজিদে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

'(হে নবী আপনি মুসলমানদেরকে) বলুন, আল্লাহকে ভালবাসতে হলে আমাকে অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে প্রিয় করে নেবেন।' (আলে ইমরান- ৩১)

www.amarboi.org

ঈমানের পরিণতিই আল্লাহর প্রতি গভীর ভালবাসা। সে দুর্লভ ভালবাসা লাভ করার সহজ উপায় নবীকে অনুসরণ করা। ভালবাসা ব্যতীত অনুসরণ অসম্ভব। আর ভালবাসা থাকলে অনুসরণ না করে থাকাই অসম্ভব। তাই ঈমানের সাধনা যারা করতে চায়, আল্লাহর ভালবাসা যারা পেতে চায়, তাদেরকে রসূল (স.)-এর ব্যক্তিগত জীবনের সব কিছুকে মহব্বতের সাথে গ্রহণ করতে হবে।

বিশেষ করে তিনি যা কিছু বলেছেন তা সবই আল্লাহর নির্দেশে বলেছেন। কুরআন এ বিষয়ে সার্টিফিকেট দিয়েছে– 'তিনি (নবী) নিজের প্রবৃত্তি হতে (কোন) কথা বলেন না, যা বলেন তা ওহি ব্যতীত আর কিছুই নয়।' (আন-নাজম-৩৪)

নবুয়তের দায়িত্ব অর্পিত হবার পর তাঁর দীর্ঘ তেইশ বছরের ঘটনাবহুল জীবনে যে কয়টি কথা ওহি নয় তা হাদীস বিশারদগণ স্পষ্টভাবে বাছাই করে বের করেছেন। তদুপরি নবী জীবনের ব্যক্তিগত পছন্দ এবং অভ্যাসের যে সব বিষয় তাঁর উম্মতের অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই তাও ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ঐগুলি ছাড়া হযরতের ব্যক্তিগত জীবনের অভ্যাসসমূহও যে তাঁর উম্মতের জন্যে আদর্শ তা ঐ সম্পর্কিত অসংখ্য হাদিস থেকেও প্রমাণিত।

সমাজ জীবনে নবীর আদর্শ

ব্যক্তিগত জীবনের সকল স্তরে ও অবস্থায় মহানবী যেমন অতুলনীয় আদর্শ, তেমনি সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগে তিনিই বিশ্বমানবতার একমাত্র অনুসরণযোগ্য আদর্শ। মানুষ মাত্রই শান্তির কাঙাল। আর এজন্যে সমাজ জীবনে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই সভ্যতার এতো উত্থান পতন। শান্তির প্রচেষ্টাই মানব জাতির ইতিহাসকে বিচিত্র রূপ দান করেছে। তবু মানুষের শান্তি সন্ধানের প্রচেষ্টার শেষ হচ্ছে না। মানুষ শান্তি খুঁজে পাচ্ছে না। যতই সভ্যতার উন্নতির দাবী করা হোক না কেন মানুষ শান্তির জন্যে বিভিন্ন আদর্শ ও পথ গ্রহণ করছে, আবার তা বর্জন করছে। এমনিভাবে মানুষ চিরদিন শান্তি-মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছে।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরব ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত বিশ্বের নিকৃষ্টতম দেশ। কিন্তু সেই সমাজে মাত্র তেইশ বছরে মানব সভ্যতার সুন্দরতম সমাজ কায়েম করে গেলেন যে মহামানব তাঁর নিকট কোন আদর্শ ছিল? সেই আদর্শ খোঁজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার উপরই আজ মানব জাতির শান্তি ও অস্তিত্ব নির্ভর করছে। চরম অশান্তি ও অসভ্যতার পংকিলে নিমজ্জিত আরব জাতি যে নবীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মাত্র অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বে শান্তি ও সভ্যতার উস্তাদে পরিণত হল, সে বিশ্বনবীর আদর্শকে সমাজের বিরাট ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হলে প্রথমেই সমাজ জীবনের জটিলতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা প্রয়োজন।

সমাজ জীবনের জটিলতা

মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের সমষ্টির নামই সমাজ। এই সম্পর্ক যদি সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত হয় তাহলেই সমাজ জীবন সুখের হয়। আর এর অভাবেই সমাজ জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। সমাজ জীবনে ক্ষুদ্রতম আকার হল পরিবার, যেখানে কমপক্ষে একজন পুরুষ ও একজন নারীর পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রয়োজন হয়। সমাজের এই ক্ষুদ্রতম আকার থেকে শুরু করে বৃহত্তম মানব সমাজ পর্যন্ত ছোট বড় সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানেই সমাজের সদস্যদের একে অপরের সাথে সঠিক ও সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখা সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা। পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের সাথে পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক না থাকলে তা হয়ে দাঁড়ায় একটা নিকৃষ্টতম কারাগার। কয়েকটি পরিবার মিলে যে পাড়া বা মহল্লার সৃষ্টি হয় তার

www.amarboi.org

সদস্যদের মধ্যে অর্থাৎ প্রতিবেশীর মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক না থাকলে তা সকলের জন্যে অশান্তির কারণ হয়। এরূপ অনেক পাড়া মিলে যে এলাকা হয় সেখানে লেন-দেন, জমি-জমা, হাট-বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাস্তা-ঘাট, যান-বাহন, শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক রীতি-নীতি, সভা-সমিতি, রুজী-রোজগার ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষে মানুষে যে সম্পর্কের প্রয়োজন তা যদি সুবিচার ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে শান্তিপ্রিয় মানুষের পক্ষে মানব সমাজ ত্যাগ করে জংগলে আশ্রয় নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

এই ধরনের অনেক এলাকা নিয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্র। আধুনিককালে মানুষের সমাজ জীবনে রাষ্ট্রই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও ব্যাপক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এখানে নাগরিকদের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য, সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্বন্ধ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার আপসের সম্পর্ক ইত্যাদি ইনসাফ ভিত্তিক না হলে, মানুষের জীবনে অশান্তির শেষ থাকে না। আবার যুদ্ধ, সন্ধি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাপারে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যদি ইনসাফের নীতি চালু না থাকে তবে মানুষ পশুর চেয়েও অধম জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

পরিবার থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত মানুষে মানুষে যে অগণিত সম্পর্ক রয়েছে তাকে শান্তিময় করার জন্যেই আইন-কানুন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। একাধিক মানুষ যেখানেই মিলে-মিশে শান্তিতে থাকতে ইচ্ছা করবে সেখানে ব্যক্তি মানুষকে– যার যার নিজ মর্জি, রুচী ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলতে দিলে শান্তির পরিবর্তে অশান্তির রাজত্বই কায়েম হবে।

এজন্যেই মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে মানুষ আইন-কানুন তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, সে আইনকে প্রয়োগ করে সকলকে শাসনাধীনে রাখার ব্যবস্থা করে, আইন অমান্যকারীদেরকে সমাজবিরোধী মনে করে এবং উপযুক্ত বিচার ব্যবস্থা কায়েম করে। এরূপ ক্ষুদ্রতম আকার হতে সমাজের বৃহত্তম আকার পর্যন্ত সর্বত্র আইন, শাসন ও বিচারের প্রয়োজন হয়।

নবীর সামাজিক শিক্ষা

এই জটিল সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে হযরত মুহাম্মদ (স.) কিরূপ আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করতে গেলেও এক বড় গ্রন্থে পরিণত হবে। এখানে সে বিষয়ে সামান্য ইংগিত দেয়াই শুধু সম্ভব। হযরত সমাজ জীবনের দায়িত্ব কর্তব্যের বেড়াজাল থেকে নিরাপদ দূরে অবস্থান করে আইন, শাসন ও বিচার সম্পর্কে সস্তা নছিহত খয়রাত করে এবং অবাস্তব উপদেশ দিয়ে সহজ বাহবা কুড়াতেন না। একটি নতুন জাতির পরিচালক ও নেতা হিসেবে তাকে আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত আইন-কানুনকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হতো এবং এর আলোকে আরো অনেক আইন তৈরি করতে হতো। যে আইন তিনি সমাজে সকলের উপর প্রয়োগ করতেন, নিজেকে শুধু সেই আইনের অধীনেই রাখতেন না, বরং সর্বপ্রথম তিনিই সেই আইন পালন করে দেখাতেন। আইন প্রয়োগ ও আইন অমান্যকারীকে শাস্তি দেয়ার বেলায় ধনী, গরীব, আত্মীয়, অনাত্মীয়, মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষকে এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে সমান চোখে দেখতেন। পারিবারিক জীবন হতে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত তিনি যে পূর্ণাঙ্গ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান রেখে গেছেন এখানে তার কিছু নমুনা উল্লেখ করা হলো।

পরিবারে

বিশ্বনবীর 'পরিবার পরিকল্পনা' একটি পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। তাঁর এই পরিবার গঠন প্রক্রিয়ায় স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন তথা যাবতীয় পারিবারিক সম্পর্কের জন্যে

www.amarboi.org

নবী করীম (স.) পূর্ণাঙ্গ বিধান নিজের পরিবারে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। পরিবারের আইনদাতা, শাসক ও বিচারক হিসেবে পরিবার পরিচালনার যে নমুনা তিনি রেখে গিয়েছেন তা চিরকাল মানুষের কাছে বিস্ময় হয়ে থাকবে। পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালিকা হিসেবে তিনি গৃহকর্ত্রীর যে মর্যাদা তাঁর স্ত্রীদেরকে দিয়েছেন তা নারীর মর্যাদার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যে সমাজে পরিবারের কর্তারা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে পারে না তাদের পক্ষে কোন দায়িত্ব ইনসাফের সাথে পালন করাও অসম্ভব। তাই রসূল (স.) বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে তারাই ভাল, যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট ভাল।' অর্থাৎ কোন ব্যক্তির শরীফ হওয়া সম্পর্কে সঠিক সার্টিফিকেট দেয়ার অধিকার রয়েছে তার স্ত্রীরই। অন্য মানুষের সাথে অভদ্র হওয়ায় বিপদের আশংকা আছে। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি কঠোরতর অন্যায় করেও প্রাধান্য বজায় রাখার ক্ষমতা আছে বলে অবলা বিবির সাথে ভদ্র ব্যবহার করাই কঠিন। তদুপরি অন্যদের সাথে কিছুটা দূর থেকে সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব এবং সব সময় তাদের সাথে মেলামেশাও করতে হয় না। কিন্তু স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে এবং সর্বদা মেলামেশা করতে হয় বলে স্বামীর কোন দুর্বলতা তার কাছে গোপন থাকে না তাই স্ত্রীর নিকট হতে যে ব্যক্তি ভদ্রতার সার্টিফিকেট আদায় করতে পারে সে প্রকৃতই শরীফ ব্যক্তি। বিবাহ, তালাক, ফারায়েজ (সম্পত্তি বণ্টন) ইত্যাদি পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নবী করীম (স.) যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সভ্যতার দাবীদার সকল সমাজই তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে বাধ্য। ইসলামের সামগ্রিক বিধানকে গ্রহণ না করার ফলে বিবাহ, তালাক, ফারায়েজ সংক্রান্ত কিছু কিছু আইন বিভিন্ন অমুসলিম রাষ্ট্রে চালু করায় তারা উপযুক্ত ফল পাচ্ছে না। তবুও এ দ্বারা তারা নবীর দেয়া আদর্শ অনুকরণযোগ্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে।

হযরত এইরূপে মানব জাতির জন্যে আদর্শ স্বামী এবং আদর্শ পিতা। কিন্তু পরিবারের সকলকেই যেহেতু তিনিই পুত্র, কন্যা, মাতা, ভ্রাতা হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন, সেহেতু আদর্শ পুত্র, আদর্শ কন্যা, আদর্শ মাতা, আদর্শ ভ্রাতার নমুনাও তাঁর নিকট হতেই পাওয়া যাবে।

প্রতিবেশী হিসেবে

আদর্শ প্রতিবেশী হিসেবে হযরত যে আকর্ষণীয় জীবন যাপন করেছেন তা তাঁর প্রতিবেশীনী দুশমন বৃদ্ধাকেও মুগ্ধ করেছে। অসুস্থতার দরুন বৃদ্ধা যেদিন হযরতের পথে কাঁটা বিছাতে পারেনি সেদিন তিনিই অসুস্থ বৃদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ করে প্রতিবেশীর হক আদায় করেছিলেন। প্রতিবেশীর শোকে সান্ত্বনা দেয়া, বিপদে সাহায্য করা, সুখে সাহচর্য দান করা, রোগে সাক্ষাৎ ও মৃত্যুতে সৎকার করা প্রতিবেশীর হক বলে তিনিই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। প্রতিবেশী পরামর্শ চাইলে সৎ পরামর্শ দান, কর্জ চাইলে দিতে অস্বীকার না করা, দিতে অক্ষম হলে সহানুভূতি প্রদর্শন, দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্য ধার চাইলে ধার দেয়া তিনি প্রতিবেশীর কর্তব্য হিসেবে নির্ধারিত করেছেন। এমনকি তিনি একথাও বলেছেন যে ঃ 'যে ব্যক্তি তার নিকটবর্তী প্রতিবেশীকে ভূখা রেখে নিজে পেট পুরে খায় সে মুমিন নয়।'

যদি প্রতিবেশীদের মধ্যে এই অধিকার ও কর্তব্যের উপদেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকতেন, নিজে বাস্তবে পালন করে উদাহরণ পেশ না করতেন, তাহলে আরবের স্বার্থপর সমাজে তা কখনো বাস্তবে পরিণত হতো না। আমাদের সমাজ নেতাগণ যদি নিজেদের জীবনে নবীর এই শিক্ষাকে অনুসরণ করেন তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে সমাজের অবস্থা বদলে যাবে। প্রতিবেশীর অনাচার থেকে বাঁচতে পারলে মানুষ শান্তিতে আছে বলে মনে করে। তাই মহানবীর আদর্শ যদি কোন এলাকায় কায়েম হয় তাহলে সে এলাকায় অশান্তির কোন কারণই বাকি থাকবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন ঃ 'আল্লাহর কছম (তিনবার) যার দৌরাত্ম্যে প্রতিবেশী শান্তি পায় না সে মুমিন নয়।'

www.amarboi.org

রাষ্ট্রীয় জীবনে

রাষ্ট্রীয় জীবনে আইন রচনা থেকে আরম্ভ করে তার প্রয়োগ ও বিচার ব্যবস্থা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে মদীনাকে রাজধানী করে হযরত যে আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করেছিলেন মানবজাতি সে আদর্শকে কোন কালেই ম্লান করতে পারবে না। এ বিষয়ে হযরতের কায়েম করা 'রেকর্ড' ভঙ্গ করার সাধ্য কারো নেই।

রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে আধুনিক বিশ্বে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু তা শুধু অশান্তি বৃদ্ধি করেই চলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মহানবীর রাষ্ট্রীয় আদর্শের আলোচনা করার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। বিশেষ করে আমরা বাংলাদেশের অধিবাসীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হযরতের আদর্শের অনুসারী বলে দাবী করি। আমরা এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি না। তাই প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তি বিশেষ করে রাষ্ট্র নেতাদেরকে নবীর রাষ্ট্রীয় আদর্শকে এ দেশে কায়েম করে মজলুম মানবতার সামনে দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে এগিয়ে আসা উচিত।

আদর্শ আইনদাতা, আদর্শ শাসক ও আদর্শ বিচারক হিসেবে দশটি বছর একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করে মানব সভ্যতার ইতিহাসে তিনি যে বিপ্লব এনেছিলেন তা কোন দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণ করার সাধ্য কারো নেই। তাই প্রকৃত কল্যাণব্রতী সরকার বলে দাবী করতে হলে এবং কল্যাণ আনতে হলে সে সরকারকে হযরতের আদর্শের পথ ধরে অগ্রসর হতে হবে।

নবী করীম (স.) আল্লাহর প্রভুত্ব (সার্বভৌমত্ব) ও নবীর একচ্ছত্র নেতৃত্বের ভিত্তিতে যখন রাষ্ট্র গঠনের প্রথম আওয়াজ তোলেন তখন মক্কাবাসীগণ এ থেকে বিরত থাকার বিনিময়ে বাদশাহী করার অধিকার দেয়ার প্রস্তাব করেছিল। আল্লাহর দেয়া জ্ঞানে হযরত বুঝতে পেরেছিলেন যে, এভাবে ক্ষমতা দখল করে কোন সমাজেই আদর্শ কায়েম করা যায় না। তিনি যদি শাসক হওয়াকে চরম উদ্দেশ্য বলে গণ্য করতেন বা আল্লাহর ওহি দ্বারা পরিচালিত না হতেন তবে মনে করতেন যে ক্ষমতা দখল করে অর্ডিন্যান্স বলেই তিনি আল্লাহর সব ফরমান জারি করতে পারবেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে, যাদের দ্বারা আইন প্রয়োগ করাতে হবে, যাদের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে তারাই যদি নিজেদের জীবনে সে আইন পালন করতে রাজী না হয় তবে তাদের দ্বারা কোন আদর্শই কায়েম করা সম্ভব হবে না। সেজন্য তিনি প্রথম তের বছর ধরে মক্কাকে কেন্দ্র করে– আরবের বিভিন্ন স্থানের কিছু সংখ্যক লোককে আদর্শের আলোকে গঠন করলেন। আন্দোলনের এই ব্যক্তিগঠন স্তরে তিনি মানুষের মন-মগজে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, আল্লাহর ভালবাসা ও ভয়, আখেরাতে পার্থিব জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার এবং রসূলের আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টির চেষ্টা করেন। কুরআন করীমের প্রথম তের বছরে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অধিকাংশই এ ধরনের বিশ্বাসকে অন্তরে বদ্ধমূল করার জন্যে নাযিল হয়। আল্লাহ, রসূল, আল্লাহর কিতাব ও আখেরাতের প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে যে ধরনের চরিত্র সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন নামায-রোযার মাধ্যমে তিনি কর্মীদের মধ্যে সেই সুনিয়ন্ত্রিত জীবন গঠন করতে থাকেন। এরূপ ঈমান ও চরিত্র অন্যান্য মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করার জন্যে তিনি প্রথম থেকেই তার কর্মীদলকে নিয়োগ করেন। তারা যখন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রসূলের নেতৃত্বে সমাজ গঠনের আওয়াজ তুললেন, তখন তাদের উপর নেমে এল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য সকল প্রকার কায়েমী স্বার্থের নির্যাতন। ফলে হযরতের আদর্শের সাথে তদানীন্তন সমাজে যে স্বাভাবিক লড়াই সৃষ্টি হয় তার মাধ্যমেই তিনি উপযোগী ব্যক্তি গঠনের সুযোগ পেলেন। কঠোর নির্যাতন ও ঈমানের অগ্নী পরীক্ষার ভিতর দিয়ে হযরতের কর্মীদল নিষ্ঠাবান খাঁটি আদর্শবাদী হিসেবে গড়ে উঠলেন।

www.amarboi.org

তের বছরের কঠোর সাধনায় যে সব চরিত্র সৃষ্টি হল হিজরতের পর তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েই হযরত সমাজ গঠনের কাজ শুরু করলেন। মাত্র দশ বছরে সমগ্র আরবে তিনি তাঁর আদর্শের বাস্তব রূপদান করে মানব জাতির সামনে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন।

কারো মনে যদি তাঁরই আদর্শ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা থাকে তাহলে তাকে হযরতের পরিকল্পনার আলোকে সমাজের পুনর্গঠন করতে হবে। আল্লাহর রসূলের আদর্শ সম্বন্ধে যাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান নেই, যাদের চরিত্রে সেই আদর্শের কোন পরিচয় নেই তাদের দ্বারা কোন ক্রমেই নবীর আদর্শে সমাজ গঠিত হতে পারে না। কোন দেশের সরকার যদি মহানবীর আদর্শে বিশ্বাসী হন এবং সেই আদর্শ কায়েম করতে আগ্রহান্বিত হন তাহলে নাগরিকদের মধ্যে ইসলামের উপযোগী ঈমান ও চরিত্র সৃষ্টির বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং ঈমান ও চরিত্রের ভিত্তিতে সরকারকে পুনর্গঠন করতে হবে। তা না হলে নবীর আদর্শের বিপরীত চিন্তা ও চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মুখে আল্লাহ, রসূল ও ইসলামের নাম লক্ষ কোটিবার উচ্চারিত হলেও তাদের পক্ষে সে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সম্ভব হবে না।

যদি কেউ সত্যিই আইনদাতা হতে চায়, তাহলে হযরতকে অনসুরণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। আমেরিকা, ইংল্যান্ড বা রুশ-চীন হতে তা পাওয়া সম্ভব নয়। আদর্শ শাসক সৃষ্টি করতে চাইলে রসূলের কাছে ফিরে যেতে হবে। বিচার ব্যবস্থাকে পূর্ণ ইনসাফ ভিত্তিক করে গড়তে হলে হযরতের নিকট থেকেই সবক নিতে হবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

মানুষের শারীরিক (বস্তুগত) অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে যে সব জিনিসের প্রয়োজন তার উৎপাদন, বিনিময়, ব্যয় ও উদ্বৃত্তের ব্যবহার সম্পর্কে সমাজে সুষ্ঠু নিয়মনীতি না থাকলে মানব জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। আল্লাহ পাক সমস্ত জীবের উপযোগী রিজিক সৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ 'এমন কোন প্রাণী নেই যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত নয়।' (হুদ-৬)

কিন্তু সমাজের পরিচালকগণ উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে নিজেদের বুদ্ধি সর্বস্ব যে সব নীতি গ্রহণ করেন তারই ফলে অর্থনৈতিক অসাম্য ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মহানবী আল্লাহর নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে আদর্শ রেখে গেছেন তা যে কত সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিম্নের ইঙ্গিত থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে তিনি সমস্ত হারাম বস্তুর উৎপাদন নিষিদ্ধ করে সমাজে অপবিত্রতার মূলেই কুঠারাঘাত করেছেন। উৎপাদনে শ্রমের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ '(আপন শ্রমে) উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু।'

উৎপাদনে মজুরের অধিকার স্বীকার করে রসূল (স.) ঘোষণা করেন ঃ 'যারা কাজ করে জীবিকা অর্জন করে, তারা তোমাদের ভাই। তোমরা যা খাও তাদেরকেও তাই খেতে দাও, তোমরা যা পরিধান কর, তাদেরকেও তাই পরিধান করতে দাও।'

ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপারে মানুষ চিরদিনই দুই চরম সীমায় অবস্থান করে চলেছে। ব্যক্তিগত মালিকানা এতই স্বাভাবিক যে, মানুষ কোন কালেই একে অস্বীকার করতে পারেনি। কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজনে এই মালিকানাকে সঠিকরূপে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে আল্লাহ পাক যে বিধান দিয়েছেন তা গ্রহণ না করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে মানুষ দুই চরম অবস্থায় উপনীত হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে অবাধ মালিকানা যেমন নিকৃষ্ট পুঁজিবাদের সৃষ্টি করে গোটা মানবসমাজকে গুটিকয়েক পুঁজিপতির অর্থনৈতিক গোলামে

www.amarboi.org

পরিণত করে, তেমনি সমাজের স্বার্থকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে 'সমাজতন্ত্র' ব্যক্তির সকল স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। প্রথমটি রাজনৈতিক স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে অর্থনৈতিক দাসত্বের সৃষ্টি করে আর দ্বিতীয়টি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নামে মানুষকে রাজনৈতিক দাসত্বে শৃঙ্খলিত করে এবং মানবাধিকারকে পদদলিত করে।

হযরত মুহাম্মদ (স.) ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কে উপযুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধান দিয়েছেন যা মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আযাদীকে সযত্নে রক্ষা করে। প্রথমতঃ ব্যক্তি যা কিছু উপার্জন করবে সেখানে বস্তু ও উপার্জনের উপায় সম্পর্কে বহু স্পষ্ট বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ হালাল বা বৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পদ ও তার যথেচ্ছা খরচ করার অধিকার নেই। এক্ষেত্রে অনেক নিয়ম কানুন তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, রাষ্ট্র ইত্যাদির হক আদায় করা অপরিহার্য করা হয়েছে। বিলাসিতাকে বহুলাংশে খর্ব করে দেয়া হয়েছে। অপব্যয়কারীকে পবিত্র কুরআনে 'শয়তানেরই ভাই' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এরূপে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করার পর যে সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকবে তার উপর প্রতি বছর যাকাত আদায় করা ফরজ করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকদের প্রেরণায় সম্পদশালীরা সবসময়ই অক্ষম ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্যে বায়তুলমালকে সমৃদ্ধ করবে। এই আদর্শ রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর খলিফাগণ স্পষ্টরূপে কায়েম করে দেখিয়েছেন।

এরপরও যদি কোন ব্যক্তির নিকট সম্পদ জমা হয়ে যায় তবে তার মৃত্যুর সাথে সাথে তা আর কেন্দ্রীভূত থাকতে পারবে না। ব্যক্তিগত মালিকানা যাতে সমাজের স্বার্থকে নষ্ট করতে না পারে সে জন্যে নবী (স.) কুরআনের নির্দেশে 'ফারায়েজ' ব্যবস্থা জারি করে গিয়েছেন। এর ফলে বহু লোকের মধ্যে সম্পদের বণ্টন বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে।

পুঁজিবাদের প্রধান বাহন হিসেবে যে দুটি ব্যবস্থা অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে তা রসূলের আদর্শে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। প্রথমতঃ সুদ ব্যবস্থা। ইসলাম এর বিরুদ্ধে কঠোর জিহাদ ঘোষণা করেছে। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসা বাণিজ্যের অবাধ স্বাধীনতা। এর ফলে কয়েকজন বড় ব্যবসায়ীর মুনাফাখোরী মনোবৃত্তি অগণিত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ক্রেতার জীবন ধারণ অসম্ভব করে তোলে। মহানবী (স.) বলেন, 'চল্লিশ দিন খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত রাখার পর যদি কেউ তা (বিনামূল্যে) দান করেও দেয়, তবে এই অপরাধ ক্ষমা করা হবে না।'

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে রসূল (স.) এত বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন যে, তা কোন সমাজে কায়েম হলে বণ্টন ও বিনিময় সুষ্ঠু না হয়েই পারে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষ সবচেয়ে সহজে পথ হারা হয়ে পড়ে। নবীর আদর্শ তাকে এখানে সরল ও সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ বাধলে কোন নীতিতে যুদ্ধ পরিচালিত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে মহানবী (স.) যে আদর্শ পালন করে গেছেন আধুনিক ও সভ্য নামে খ্যাত রাষ্ট্রসমূহ তা কল্পনা করতে অক্ষম। যুদ্ধের ময়দানেও তিনি আদর্শ। আদর্শ সৈনিক, আদর্শ সেনাপতি, আদর্শ বিজয়ী হিসেবে হযরতের সমকক্ষ কোন মানুষই ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। হযরত নিজের জীবনে সাতাশটি যুদ্ধের মধ্যে নয়টিতে সেনাপতিত্ব করেছেন। যুদ্ধে তার নীতি ছিল, বিপক্ষের আক্রমণকারী সৈন্য ব্যতীত আর কাউকে আক্রমণ না করা। সাধারণ নাগরিক, ধর্মস্থান, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ফসলের জমি, ফলবান বৃক্ষ, জীব-জানোয়ার ইত্যাদির উপর হামলা করা কঠোরভাবে নিষেধ ছিল। যুদ্ধ-বন্দীদের আরাম ও খাওয়ার ব্যবস্থা না করে নিজের সৈন্যদের আরাম করা নিষেধ ছিল।

www.amarboi.org

সন্ধির বেলায় হযরতই বিশ্বের আদর্শ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। অপর পক্ষ সন্ধি ভঙ্গ না করা পর্যন্ত তিনি সন্ধির শর্ত কখনো লংঘন করেননি। নবীর আদর্শ সবক্ষেত্রে এরূপ শান্তিকামী বলেই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ 'সমগ্র বিশ্বের জন্যে শুধু রহমত হিসেবে আপনাকে প্রেরণ করেছি।'

মহানবী শুধু রহমাতুললিল মুসলেমিন বা রহমাতুললিন নাসই নন। অর্থাৎ তিনি যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তা শুধু মানুষের মাঝেই শান্তি আনে না, জীবজগত এবং বস্তু জগতেও তা অশান্তির প্রতিরোধ করে। পক্ষান্তরে আধুনিক সভ্যতা প্রাকৃতিক জগতেও অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। নবীর আদর্শ ব্যতীত মানুষ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে যত চেষ্টাই করুক তা অশান্তি বৃদ্ধিই করবে। আল্লাহ পাক তাই বজ্র কঠোর ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন ঃ 'জলে স্থলে যে বিশৃংখলা বিরাজ করছে তা মানুষ নিজ হাতেই অর্জন করেছে।' (আর রুম- ৪১) এভাবে বিচার করলে গোটা নবী জীবনই মানুষের জন্য অকৃত্রিম আদর্শ। কিন্তু বর্তমানে কোন দেশে মহানবীর আদর্শ পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত নেই বলে সে আদর্শকে একটি 'থিওরী' হিসেবে অধ্যয়ন করতে হচ্ছে। শুধুমাত্র চিন্তাশীল লোকের পক্ষেই কোন আদর্শকে থিওরী হিসেবে উপলব্ধি করা সম্ভব। কিন্তু যখন কোন মতবাদ বা 'থিওরী' মানুষের সমাজে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখনই কেবল সাধারণ মানুষ চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই তার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করতে পারে। এজন্যেই নবীজীর আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে নবী জীবনকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা অসম্ভব।

তাই যারা হযরতকে নবী বলে স্বীকার করেন, তার আদর্শকে অনুসরণযোগ্য বলে প্রচারও করেন তাদেরকে নবীর আদর্শ বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করে এর প্রকৃত রূপ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে। সে চেষ্টা না করে তারা যদি শুধু মিলাদ মাহফিলে নবী জীবনের গুণাবলী চর্চা করেন তাহলে কোন দিনই তাঁর আদর্শ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে স্পষ্ট ধারণা দেয়া সম্ভব হবে না।

রসূল (স.) তার আদর্শ সম্পর্কে মানুষকে ওয়াজ নসীহত করেই দায়িত্ব শেষ করেননি। আল্লাহর দেয়া একমাত্র সত্য জীবন ব্যবস্থাকে (দ্বীনে হক) দুনিয়ার বুকে কায়েম করে মানুষের সামনে নবীর আদর্শ তুলে ধরার জন্যে আল্লাহ পাক তাঁকে প্রেরণ করেন। কুরআন মজিদে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

আল্লাহ বলেন ঃ 'তিনিই (ঐ সত্তা) তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্যদ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন যেন (রসূল) অন্যান্য সমস্ত দ্বীনের (বাতিল দ্বীনের) উপর এ দ্বীনকে বিজয়ী করেন।' (আত তাওবা-৩৩, আল ফাতাহ-২৮, আস সফ-৯)

যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ প্রদত্ত এই সত্য জীবন ব্যবস্থা আরবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি ততদিন পর্যন্ত এর সত্যতা প্রকাশিত হয়নি। মদীনাতে এই আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ গঠন হওয়ার পূর্বে মাত্র কিছু সংখ্যক চিন্তাশীল ও সত্যানুসন্ধানী মানুষ তা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ দ্বীনে হক যখন বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হল এবং সাধারণ মানুষ তার সৌন্দর্য দেখতে পেল তখন দলে দলে তারা তা গ্রহণ করতে এগিয়ে এল। কেননা তখন তারা স্পষ্ট বুঝতে পারল যে নবীর দ্বীনই একমাত্র সত্য এবং অন্যান্য সকল দ্বীন একেবারেই বাতিল। নবীর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবার আগে তা যে একমাত্র হক তা প্রকাশিত হয়নি, ফলে তা বিজয়ী হতে পারেনি।

সুতরাং নবী জীবনের আদর্শ শুধু আলোচনা ও প্রশংসার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার বিষয় নয়। বরং দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর বাস্তবরূপ ও সত্যতা প্রকাশের জন্য জানমাল কোরবানী করাই চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। যারা নবীর আদর্শকে জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ

www.amarboi.org

করতে রাজী নয়, তাদের মুসলিম হওয়ার দাবী নবীর জীবনাদর্শের ক্ষতিই করে থাকে। যারা নবীর আদর্শকে শুধুমাত্র ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের কোন অংশে পালন করে সমাজে ধর্মনেতা হিসেবে পরিচিত হয়েছেন তারা নবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এগিয়ে এলে সাধারণ মুসলমান জান-মাল কোরবান করতে সহজেই প্রস্তুত হবে।

আদর্শ প্রতিষ্ঠায়

মহানবীর আদর্শ কিভাবে কোন পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে? প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতিগত আদর্শও তিনি দেখিয়ে গেছেন। তাঁর কাছ থেকেই তা গ্রহণ করতে হবে। তাই তাঁর জীবনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নিজে নিজে চিন্তা, বুদ্ধি ও রুচী অনুযায়ী পদ্ধতি আবিষ্কার করার কোন অবকাশ নেই। তার আদর্শ প্রতিষ্ঠার কর্মপন্থায়ও তিনিই একমাত্র আদর্শ। ব্যক্তি গঠনের কঠিন স্তর অতিক্রম না করে, ইসলামের জ্ঞানে সমৃদ্ধ, ঈমানের বলে বলীয়ান ও চরিত্রে সুসজ্জিত একটি দল গঠনের আন্দোলন ব্যতীত এবং সমাজে এই দলের লোকদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কোন পথেই সে আদর্শ কায়েম হতে পারে না। এ প্রচেষ্টার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনৈসলামী সমাজের নেতৃবৃন্দ ঐ দলের উপর অত্যাচার করবেই। হককে প্রতিষ্ঠা করার পথে বাতিলের সাথে টক্কর অবশ্যই হবে। এটা এড়িয়ে ইসলাম কায়েম করতে চাইলে তা শুধু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ রেখেই সম্ভব। গোটা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

স্বীকৃত আদর্শ

উপসংহারে একটা কথা প্রকাশ করা প্রয়োজন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই অনুকরণ ও অনুসরযোগ্য আদর্শ হিসেবে স্বীকার করা ছাড়া মানুষের উপায় নেই। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এমনকি যুদ্ধের ময়দানে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বেলায় তাঁর দেয়া নিখুঁত আদর্শকে অগণিত চিন্তাশীল অমুসলিম ব্যক্তিও প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাঁকে আদর্শ স্বীকার করেও তারা তাকে অনুসরণ করতে পারেননি। হযরতের আদর্শকে গ্রহণ করার মত সাহস ও যোগ্যতা না থাকলেও বিশ্বের মানুষ সে আদর্শের প্রশংসা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। মুসলমানরাও যদি ঐসব অমুসলিমের ন্যায় নবীর আদর্শকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ না করে, তারাও যদি শুধু মুখে মুখে স্বীকার করেই মুক্তি পেতে চায় তবে কোন কারণে আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমার যোগ্য মনে করবেন? কি কারণে অমুসলিমদের থেকে তাদের মর্যাদার পার্থক্য হবে? প্রবৃত্তির দাসত্ব আর ভোগসর্বস্ব জড়বাদী জীবন যাপনে অভ্যস্ত মানুষের কাছে মহানবীর নিষ্কলুষ জীবনাদর্শকে বাস্তবে অনুসরণ কঠিন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তার আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে কারো পক্ষে মনুষ্যত্বের দাবী করা সম্ভব নয়। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে জানতে দিয়েছে অনেক অজানা রহস্য, উড়তে শিখিয়েছে মহাশূন্যে, আয়ত্তে এনে দিয়েছে জীবনে আরাম আয়েশের উপকরণ, আবিষ্কার করেছে সে প্রলয় সৃষ্টিকারী মারণাস্ত্র। কিন্তু দুনিয়ার বুকে 'মানুষ' হিসেবে জীবন যাপন করার পথ সে আবিষ্কার করতে পারেনি। সে পথ দেখিয়েছে মহানবীর আদর্শ। মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চাইলে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করতে হলে, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবনের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে চাইলে, সর্বোপরি মানুষের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা ছাড়া আর কেন দ্বিতীয় পথ নেই।

www.amarboi.org

অধ্যাপক গোলাম আযম রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

১. বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি
২. ইকামাতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীন
৩. আসুন আল্লাহর সৈনিক হই
৪. ইসলাম ও গণতন্ত্র
৫. মনটাকে কাজ দিন
৬. শেখ হাসিনার দুঃশাসনের পাঁচ বছর
৭. ২০০১ সালের নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার আজব রাজনীতি
৮. কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি উদ্ভাবনা, প্রস্তাবনা ও আন্দোলন
৯. জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি
১০. ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা
১১. একজন মানুষ যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যাবশ্যক
১২. নবী জীবনের আদর্শ

আল আযামী পাবলিকেশন্স
১১৯/২ কাজী অফিস লেন
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭